



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - i, Published on January issue 2026, Page No. 468 - 473

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 – 0848

সত্তরের দশকে নির্বাচিত পুরুষ কথাকারের চোখে নারীর অবস্থান

মৌসুমী মুখার্জী

গবেষক, সংস্কৃত কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়

Email ID: 725mousumi@gmail.com



Received Date 20. 01. 2026

Selection Date 10. 02. 2026

Keyword

Women's heart,
Women's
existence, social
responsibilities,
self-
independence,
relationship
tension, women
psychology,
selfcare, struggle
of life.

Abstract

Nowadays women are Self Conscious. They are flexible for working both as home makers or earning money from outside. In present days, a writer makes his story with modern women characteristics. In 1970, workers of Durgapur industrial belt published a little magazine named 'Nim Sahitya'. Writers of Nim Sahitya were workers. They made their literary base and called it 'Tikta Birakta Sahitya'. In their literature women are soft hearted as well as strong. They emphasized women's bodies and sexual life. In their story, the wife and mother cried silently for their husband and son's death, who were workers. On the other hand, women start working hard for her family. In our patriarchal society, men harassed and used women. But now women are enjoying themselves with men shamelessly. Without any doubt they go out with bad boys with their own concern, they do confidential meetings, join politics also. Nim writers were frustrated with their life. Their literary language is bitter which is similar to nim leaf. They called their women, 'neki half akhrai' etc. Men cant take any responsibilities about their unwanted babies. But women cant avoid their social responsibilities. Thats why unmarried girls used sindoor to avoid being called on bad names. Even in this modern age, women are helpless without men. This kind of irony we can see in their stories. Nim writers are Rabindra Guha, Mrinal Banik, Biman Chatterjee, Narsingha Ray. Writers of kabipatra patrika are Shaibal Mitra, Jaydeep Chattopadhyay, Rabishankar Ball, Subimal Mishra. In this essay, I will discuss about feminist urges, women's psychology and the various stages of their life reflected in their literature written by male author according to the little magazine 'Nim Sahitya'.

Discussion

আধুনিক সমাজের নারীরা বিদ্রোহী। ঘরকন্না থেকে মহাকাশ অভিযান সবকিছুতেই তাদের পারদর্শিতা সমান তাতে দেখা যায়। পূর্ববর্তী নারীদের বাইরে জগতের সঙ্গে পরিচয় ততোধিক ছিল না। নারী চরিত্রের রূপরেখা সময়ের সঙ্গে সঙ্গে

লেখকদের লেখনীতে পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের উপন্যাসে নারীরা পর্দানশীন, পতিব্রতা। সংসার সামলানোর বাইরে তাদের ভূমিকা স্বীকৃত নয় সেই সময়ের লেখায়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনার প্রথমার্ধে নারীরা কেবলমাত্র সংসারের প্রতিপালিকা হলেও পরবর্তীতে দেখা গেছে তারা পুরুষদের সঙ্গে মিশে, ইংরেজি বুলি আউড়াচ্ছে। স্বর্ণকুমারী দেবী, শান্তা দেবী, রানী নিরুপমা দেবী প্রমুখের রচনায় নারীর স্নেহময়ী রূপ, নারীর দুঃখ, ভাবালুতা ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য দেখতে পাওয়া যায়। ১৩৩০ সালে প্রকাশিত হয় ‘কল্লোল’ পত্রিকা। এই পত্রিকার লেখকদের হাতে নারী চরিত্রের নতুন দিক নির্দেশিত হয়। কেবলমাত্র যান্ত্রিকভাবে সংসার চালানো, স্বামী সন্তানের সেবা নয় নারীর মনের মনস্তাত্ত্বিক দিক তাঁরা তুলে ধরেন তাঁদের রচনায়। ১৯৪৭ সাল থেকে দেশভাগ এবং দাঙ্গায় মানব চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়ে যায়। নারীরা পূর্ববঙ্গ থেকে প্রাণ হাতে নিয়ে ভারতবর্ষে প্রবেশ করে। তাদের চরিত্রের মধ্যে সংগ্রামী মানসিকতা প্রকাশ পেতে থাকে। পিতা সামান্য কিছু অর্থের বিনিময়ে কন্যাকে তুলে দেয় পুরুষের হাতে। এমন চিত্র ফুটে উঠেছে হাসান আজিজুল হকের ‘আত্মজা ও একটি করবী গাছ’ গল্পে। এই সময় থেকেই নারীর জীবনে সম্পর্কের মূল্যায়ন বদলে যেতে থাকে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ‘পূর্ব-পশ্চিম’ উপন্যাসে দেখা যায় তুতুল তার মামাতো ভাইয়ের প্রেমে পড়েছে। ১৯৬০-১৯৭০ এই সময়ে দেখা যায় উচ্চশিক্ষায় নারীদের প্রবল আগ্রহ। পুরুষ সহপাঠীর নিকট তাদের লজ্জা ধীরে ধীরে মুছে যেতে থাকে। নারীরা যেমন অভাবের তাড়নায় চাকরি করেছে, তেমনভাবে পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হয়ে মিছিল, মিটিং, গোপন বৈঠকে যোগদান করেছে। সত্তরের দশকে দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের কারখানায় কর্মরত শ্রমিকরা ১৯৭০ সালে ‘নিম সাহিত্য’ পত্রিকা প্রকাশ করেন। নিম সাহিত্যের লেখকগণ ছিলেন শ্রমজীবী মানুষ। তাঁরা তাঁদের পরিবেশ পরিস্থিতির নিরিখে গড়ে তোলেন এক ধরনের সাহিত্য। যাকে তাঁরা ‘তিক্ত বিরক্ত’ সাহিত্য বলে আখ্যায়িত করেন। স্বাধীনতার পরবর্তী সময় থেকেই মানুষের জীবন, মনন বদলে গেছে। দেশভাগের যন্ত্রণা, উদ্বাস্ত সমস্যা, দাঙ্গা, প্রবল আর্থিক কষ্ট মানুষের জীবনের রীতিকে বদলে দিয়েছে। বেকারত্ব সমস্যা যুবসমাজের মধ্যে হীনমন্যতা তৈরি করেছে। ১৯৬৭ সালে নকশাল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে পশ্চিমবঙ্গ তথা কলকাতা শহর উত্তাল হয়ে ওঠে। ক্রমাগত মৃত্যু ভয় মানুষকে তাড়া করে। এই কালপর্বে কলকাতা থেকে অনেকদূর দুর্গাপুরে বসেও নিম সাহিত্যিকরা নিজেদের জীবনকে খোঁজেন। প্রতিনিয়ত জীবনের সঙ্গে পাঞ্জা দিয়ে চলতে চলতে তাঁরা ক্লান্ত। সুতরাং কলকাতায় বসে সেই সময় যাঁরা সাহিত্য রচনা করেন তাঁদের থেকে নিম লেখকদের দৃষ্টিভঙ্গি বহুলাংশেই আলাদা ছিল। কারখানায় ধর্মঘট, শ্রমিক মৃত্যু, নকশাল ভেবে পুলিশি ধরপাকড়, কারখানার প্রচণ্ড উত্তাপ, মালিক শ্রেণীর প্রতিশ্রুতিহীনতা ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা নিম সাহিত্যিকদের প্রচণ্ডভাবে প্রভাবিত করেছে। তাঁদের রচনা তাই বিষয় এবং আঙ্গিকের দিক থেকে ভিন্নধর্মী। তাঁদের সাহিত্যে নারীদের কমনীয় রূপের পাশাপাশি কঠোর রূপও চিত্রিত হয়েছে। নারীদের শরীর, যৌনতা সেখানে প্রাধান্য পেয়েছে। কারখানায় কর্মরত সন্তান এবং স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে নারীর নিঃশব্দ কান্না, সামান্য ভাতের জন্য নারীদের কঠিন সংগ্রাম চিত্রিত হয়েছে তাঁদের লেখায়। পুরুষ যেমন নারীকে নিয়ে ফুটি করেছে, তেমন ভাবেই আধুনিক নারীরা ছুঁমার্গে তুলে পুরুষদের সঙ্গে অবলীলায় ঘুরতে যেতেও দ্বিধাবোধ করেনি। নারী জীবনের বিভিন্ন রূপ ফুটে উঠেছে তাঁদের লেখনীতে। নিম লেখকগণ নিজেদের জীবনযাপন নিয়ে প্রচণ্ড বিরক্ত ছিলেন। ব্লাস্ট ফার্নেসের প্রচণ্ড উত্তাপে তাঁদের ভাষাও ছিল বারুদের মত ভীষণ এবং নিমের মতোই তিক্ত। নারীদের সম্বোধনের ক্ষেত্রেও তারা অশালীন শব্দ প্রয়োগ করেন, যেমন - ‘নেকী-হাফ আখড়াই’ ইত্যাদি। পুরুষের লালসার শিকার কুমারী মেয়ে, কিন্তু পুরুষ তার নবজাত শিশুর দায়ভার গ্রহণে অপারগ। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা নারীরা কখনোই উপেক্ষা করতে পারেনি, তাই লোকলজ্জার ভয়ে কুমারী মা সন্তান ত্যাগ করেছে, কপালে সিঁদুর পড়েছে এমন চিত্র দেখা গেছে তাঁদের রচনাগুলিতে। অসহায় স্ত্রী স্বামীকে কাছে পাওয়ার তীব্র আকুতি এবং স্বামীর অবর্তমানে প্রচণ্ড জীবন সংগ্রাম করার মানসিকতা নারী চরিত্রের মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন লেখকগণ। নিম সাহিত্যিক হিসেবে আমরা মৃণাল বণিক, রবীন্দ্র গুহ, বিমান চট্টোপাধ্যায়, অজয় নন্দী মজুমদার, নৃসিংহ রায় প্রমুখের কথা পাই। আমার প্রবন্ধটিতে এই লেখকদের লেখনীকে কেন্দ্র করে ঘরে বাইরে নারী চরিত্রের বিকাশ, সমাজে তাদের অবস্থান কেন্দ্রিক দীর্ঘ আলোচনা করার চেষ্টা করেছি।

নিম সাহিত্যিকেরা দীর্ঘদিন ধরেই কঠোর জীবন যাপন করেছেন। তাঁদের জীবন ছিল ক্লান্ত। যুব ধর্মের নিরিখে এবং পরিবেশ পরিস্থিতির শিকার এই সকল লেখকগণ নারীদের ভোগ্যবস্তু রূপে দেখেন। মৃণাল বণিকের ‘বিষম বাদুড়’

গল্পে দেখা যায় কথক বারবার বলেন তিনি তাঁর প্রাক্তন প্রেমিকা সর্বাণীর মাড়ি চাটতে চান। অবদমিত কামুক প্রবৃত্তি থেকেই এই ধরনের ইচ্ছে তৈরি হয়। বাদুড় অন্ধকারের জীব। মানুষের মনোজগতের অন্ধকার কুৎসিত কামনা এবং অপ্রাপনীর প্রতি তীব্র আকাঙ্ক্ষা থেকেই কথকের এমন মনে হয়েছে। আবার ‘টিকটিকির তলপেট ও তিনটি যুবক’ গল্পে দেখা যায় একজন কুমারী রক্তাক্ত জরায়ু অ্যাম্বুলেন্সের ভেতর ফেলে গেছে। সমাজের পুরুষেরা নারীকে ভোগ করেছে। ভূমিষ্ঠ শিশুর দায়িত্ব নেয়নি। নারীর পক্ষে তাই সমাজকে উপেক্ষা করে কোনোভাবেই বিয়ের আগে সন্তান পালন সম্ভব নয়। নারী ভ্রূণ অবস্থায় তাকে হত্যা করে অথবা রাস্তায় ফেলে যেতে বাধ্য হয়। বহুক্ষেত্রে দেখা যায় মেয়েরা সমাজের প্রতিও দায়বদ্ধ। ১৯৮২ সালে প্রকাশিত ‘কবিপত্র’ পত্রিকার লেখক স্বপন সেনের ‘জন্মভূমির দলিল’ গল্পে দেখা যায় কুমারী মেয়ের অসহায়তা। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর সন্তান ধারণের স্বীকৃতি বিবাহের উপরই নির্ভরশীল। তাই কুমারী মাতা লোক লজ্জার ভয়ে কপালে সিঁদুর পড়েছে।

নারীর বৈধব্য যোগ তার জীবনে স্বাভাবিক ছন্দকে ব্যহত করে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই অসহায় নারীর কিছুই করার থাকে না। বিমান চট্টোপাধ্যায়ের ‘এলেবেলে জীবন’ রচনাটিতে দেখা যায় শ্রমিক স্বামী, সন্তানই সংসারে একমাত্র চাকুরিজীবী। কারখানায় অপঘাতে সেই শ্রমিকের মৃত্যু হলে নিঃশব্দ কান্না ছাড়া তার মা এবং স্ত্রীর কোন ভূমিকা থাকে না। পুরুষ লেখকগণ বিধবা নারীদের করুণ জীবনের কথা তুলে ধরলেও, সেই জীবন থেকে উত্তরণের প্রসঙ্গ স্পষ্ট ভাবে তুলে ধরেন নি তাদের লেখায়। মধ্যবিত্ত পরিবারে নারীরা সংসার দেখাশোনা করে। পুরুষেরা বাইরের জগতে ব্যস্ত থাকে। স্ত্রীর অন্দরমহলে ছোটখাটো ভুল নিয়ে তিরস্কার করে। নারীর প্রতি বিন্দুমাত্র কৃতজ্ঞতা পুরুষের মধ্যে দেখা যায় না কোন কোন ক্ষেত্রে। নিম্ন সাহিত্যিকরা নিজেদের তথাকথিত বিশিষ্ট সাহিত্যিকদের থেকে পৃথক বলে মনে করতেন। তা সত্ত্বেও মৃণাল বণিকের ‘রাজার দুঃখ’ গল্পে লেখক বলেন, -

“বিধবার ঘরে ইঁদুর থাকে না।”^১

অর্থাৎ ইঁদুর শব্দটি লেখক এখানে রূপক হিসেবে ব্যবহার করেন, যার অর্থ অন্য পুরুষ। পুরুষ লেখক এই বাক্যে নির্দিষ্ট করে বলে দেন বিধবা নারী অন্য পুরুষকে গ্রহণ করতে পারবে না বা তাতে সামাজিক বাধা রয়েছে। নিম্ন সাহিত্যিকরা নিজেদের চলতি ধারার পরিপন্থী বলে দাবি করলেও বহু ক্ষেত্রেই তাঁরা গতানুগতিক ধ্যান ধারণার বাইরে বেরিয়ে আসতে পারেননি।

বর্তমানে নারীরা বিভিন্ন কাজের সূত্রে বাইরে জগতের সঙ্গে মেলামেশা করছে। আধুনিক সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাত ধরেই নারীরা বাইরে জগতে পদার্পণ করে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিভিন্ন রচনায় দেখা যায় নারীরা শিক্ষার উদ্দেশ্যে স্কুল কলেজ গেছে এমনকি অবলীলায় পুরুষ বন্ধুর সঙ্গে মেলামেশাও করেছে। যার উদাহরণ হিসাবে ‘শেষের কবিতা’ উপন্যাসের কেতকী মিত্র চরিত্রটি যথার্থ। পরবর্তীতে আধুনিক নারীদের গৃহজীবন বিশেষত কর্মজীবনের সুস্পষ্ট চিত্র আমরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখকের লেখনীতে পাই। নৃসিংহ রায়ের ‘বুকের ভিতর চোখ’ গল্পে তার টুকরো চিত্র পাওয়া যায়। নার্স বাসে করে কাজের জায়গায় যায়, বাসের মধ্যে শাড়ি নিয়ে আলোচনা কিংবা বাসের মধ্যে গুরু গম্ভীর মহিলার ভারিঙ্কি চাল গল্পটিকে বাস্তবসম্মত করে তুলেছে। ছক ভাঙার গল্পকার হিসাবে নৃসিংহ রায় পরিচিত। তবুও সমাজের মূল সমস্যার ছক ভাঙার প্রচেষ্টা তাঁর গল্পে দেখা যায় না। নৃসিংহ রায়ের অনুগল্প ‘গল্পের আমেজ’। গল্পে দেখা যায় সমাজের বিভিন্ন অবস্থান থেকে বিভিন্ন মানুষ একজন নারীকে নানাবিধ উপমায় ভূষিত করেছে। আধুনিক সমাজে বিবাহ বিচ্ছেদ হওয়ায় পুরুষ লেখক নারীটিকে বলেন ‘পোকায় কাটা - ডিভোর্সড।’ নারীর বাইরের দৈহিক সৌন্দর্য ও সামাজিক অবস্থান প্রাধান্য পেয়েছে সমাজের চোখে, যার বাস্তবসম্মত চিত্র পাই গল্পে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে নারীর দেহ বরাবরই ভোগ্য পণ্য হিসেবেই চিহ্নিত করা হয়। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘বিচারক’ গল্পে ভদ্র বাড়ির বিধবা মেয়েকে কুপথে টেনে নিয়ে যায় এক পুরুষ। এরপর থেকে সাহিত্যে বারবার নারীর পদস্থলনের চিহ্ন পাঠক দেখে চলেছে। বিশেষত কল্লোল যুগে প্রেমেন্দ্র মিত্রের হাত ধরে সমাজের দলছুট এইসব নারীদের গতিপ্রকৃতি আমরা আরো ভালোভাবে জানতে পারি। নারী জীবনের এমনই একটি গল্প হল অজয় নন্দী মজুমদারের ‘পিনকুশান’। নগর সভ্যতায় শহরের শিক্ষিত ধনীশ্রেণি পয়সার বিনিময়ে নারী দেহের সঙ্গে মিলিত হয়। শেষ পর্যন্ত নারী নরকের জীবন ভোগ করে। সকালের আলোয় ধনী শহরে মানুষেরা

সেইসব মেয়েদের চিনতেও পারে না। ঘৃণাবশত নিজেদেরকে তাদের থেকে দূরে সরিয়ে রাখে। নারীর শরীর পুরুষের কাছে হয়েছে ভোগ্য পণ্য। নৃসিংহ রায়ের ‘বর্তমান পুরুষ’ গল্পে লেখক বলেন, -

“দশ আঙুলে গোলাপটাকে ধর্ষণ করে - বিবস্ত্র-ছিন্নভিন্ন-কুটিকুটি। তারপর জ্বুতো দিয়ে মাড়িয়ে দৌড়ে এক ছুটে বাইরে বেরিয়ে আসে।”^২

অর্থাৎ গোলাপ শব্দটি ব্যঙ্গনাধর্মী। সমাজে নারীকে এভাবেই পুরুষ ভোগ করছে এবং শেষপর্যন্ত অপ্রয়োজনীয় বস্তুর মত ছুড়ে ফেলে দিতে দ্বিধাবোধ করছে না। নিম্ন লেখকদের রচনায় নারী শরীরকে দ্রবীভূত যৌনতা প্রাধান্য পেয়েছে। নৃসিংহ রায়ের ‘চাকায় রাস্তায় কাঁটাতারের বেড়ায় কার মুখ’ রচনায় লেখক বলেন, -

“এতক্ষণে বোঝা গেল কান্না নয়, স্বাদিষ্ঠ যুবতী শরীরের কণ্ট চারদেয়ালে এমনই ঝাপায়,”^৩

যৌনতাধর্মী আলোচনা অনেক বেশি লক্ষিত হয় তাঁদের রচনায়। এইসব লেখায় নারী দেহের বর্ণনা, বিকৃত যৌন কামনার চিত্র ফুটে উঠেছে পুরুষ লেখকদের হাতে। নারী দেহ কৈশোর থেকে যৌবনে পদার্পণ করার সুস্পষ্ট রেখাচিত্র তুলে ধরেন নিম্ন লেখকগণ। নৃসিংহ রায়ের ‘মুন্সিরামের ইস্ট ভূমিকা ও জামানত’ গল্পে লেখক বলেন, -

“মেয়েটি ফ্রক ছেড়ে আসতে আসতে শাড়ি পেঁচিয়ে কখনো এজ্ঞা, কমলা কখনো ভরন্তু ঝতু হয়ে উঠতে উঠতে থাকলো।”^৪

অর্থাৎ একটি মেয়ের কৈশোর থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হওয়া এবং ঝতুমতী হওয়ার স্পষ্ট বর্ণনা পাই এই গল্পে।

এমনকি সমাজের অন্যান্য নারীরা পতিতা নারীদের থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে চলে। অজয় নন্দী মজুমদারের ‘পিনকুশান’ গল্পে লেখক বলেন একজন ভদ্রমহিলা অনাহারী অনাদৃত মেয়েটির মুখের উপর একটি পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গর্বিত সুরে বলে, -

“যত্নোসব - এই বলে এক ভদ্রমহিলা মেয়েটার দিকে কয়েকটা পয়সা ছুঁড়ে দিয়ে গর্বিত ভাঙ্গা গলায় বললেন - ভাগ।”^৫

গল্পগুলি পাঠ করলে দেখা যায়, নারীর অগ্রগতির ক্ষেত্রে সবথেকে বেশি পিছুটান তৈরি করেছে নারীরাই।

আধুনিক লেখকগণ নারী দেহকে প্রাধান্য দেন চরিত্রকে উন্মুক্ত করা বা গতিদান অথবা বিপণনের প্রয়োজনে। বিভিন্ন অদ্ভুত উপমা দিয়ে তাঁরা নারীর শরীরকে বর্ণনা করেছেন। অজয় নন্দী মজুমদারের ‘অ-মানুষ’ গল্পটি এর একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। ভেটকি মাছ দেখে গুরু নিতম্বিনী গর্ভবতী মহিলার কথা লেখকের মনে হয়েছে অথবা মৃগেল মাছের লালচে ঢল ঢল ভাবের সঙ্গে নারী বক্ষের তুলনা করেন। আধুনিক সমাজে মেয়েরা চাকরির জন্য অথবা নিজেদের প্রয়োজনে বাইরে বের হয়। কিন্তু অতি আধুনিক হওয়া সত্ত্বেও নারীরা পুরুষের লোলুপ দৃষ্টির হাত থেকে আজও মুক্তি পায় না। তেমনই একটি চিত্র পাই উদয়ন ঘোষের ‘শান্তনুর পিতৃধিক্য’ নামক গল্পে। যুবতীর ব্রা এখানে পুরুষের কাছে লোভনীয় এবং দর্শনীয় বস্তু। বাসের মহিলা যাত্রী পুরুষের দ্বারা নিগৃহীত হওয়ার নিখুঁত দৃশ্য গল্পটিতে পাওয়া যায়। ভোগ্য পণ্য অতিরিক্ত বিক্রির টোপ হিসাবে নারী শরীর ব্যবহৃত হচ্ছে। তাই গল্পে দেখা যায় রেডিও বিক্রির বিজ্ঞাপনে গেঞ্জি পরিহিত নারীর মূর্তির প্রসঙ্গ লেখক রচনাটিতে তুলে ধরেন। জয়দীপ চট্টোপাধ্যায় এর ‘প্রাচীন প্রশ্ন সংক্রান্ত’ গল্পে লেখক বলেন শিক্ষিত সমাজ বউ নির্বাচনের ক্ষেত্রে গায়ের রংকে প্রাধান্য দিচ্ছে। তাই দু-এক পেগ খেয়ে এসে শিক্ষিত ভদ্রলোকেরা সুন্দরী সাদা পেট বউ নিয়ে বিছানায় যায়। শিক্ষিত নারীরা নিজেদের ইচ্ছায় পরপুরুষের বিছানায় অঙ্কশায়িনী হয়। ষাটের দশকেও এই ছবি সমরেশ বসুর ‘বিবর’ উপন্যাসে দেখতে পাই।

বর্তমানে নারীরা যেমন রাজনীতির ময়দানে সাবলীল তেমনই কুটকৌশলী। অজয় নন্দী মজুমদারের ‘সমবেত জনতা ও ভগ্নাংশ’ গল্পে তিনি বলেন একজন সুন্দরী নারী অন্যজনের পা চাটছে, অর্থাৎ স্বার্থসিদ্ধির জন্য বর্তমান সমাজের মেয়েরা নিজেদের রূপকে হাতিয়ার করে মোসায়িবি করছে। রূপকের আড়ালে রাজনৈতিক চক্রব্যূহের নিখুঁত চিত্র অংকন করেন লেখক কল্যাণ মজুমদার তাঁর ‘তৃতীয় বিশ্বের মানুষ’ গল্পে। সেই চক্রব্যূহ তৈরিতে মেয়েরাও সামিল। রাজনৈতিক দলগুলি মানুষের স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে তাকে পুতুল বানিয়ে রাখার প্রচেষ্টা করে চলে অবিরত। মেয়েরা রাজনীতিতে প্রত্যক্ষভাবে বর্তমানে অংশগ্রহণ করছে এবং নিজেকে পুরুষের চোখে লোভনীয় সামগ্রী করে তুলে পুরুষকে নিজেদের

দলের কুক্ষিগত করতেও দ্বিধাবোধ করে না। নারীরা বর্তমানে আত্মসচেতন। তারা বাইরে জগতের কাছে নিজেদের পরিচ্ছন্ন নিখুঁত রূপে তুলে ধরতে চায়। পাশাপাশি কর্মজগৎ সম্বন্ধেও তারা ওয়াকিবহাল। রবীন্দ্র গুহের উপন্যাস ‘নাভিকুণ্ড ঘিরে’এ প্রসঙ্গে আলোচ্য হতে পারে। উপন্যাসটিতে দেখা যায় পুরুষেরা যেমন নারীদের নিয়ে ফুটি করেছে নারীরা, তেমনই দ্বিধাহীন ভাবে পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশা করেছে। তাদের সঙ্গে অসংকোচে ঘুরতে যাচ্ছে। নারীদের স্বাধীনচেতা জীবন যাত্রার এমন দৃশ্য পরবর্তী সময়ের লেখকদের রচনায়ও আমরা প্রত্যক্ষ করি। ‘কবিপত্র’ পত্রিকার লেখক রবি শঙ্কর বলের ‘নাজিকাহিনি’ গল্পে দেখা যায় আধুনিকমনস্ক নারীরা বিয়ের আগেই অবাধে পুরুষের সঙ্গে ঘুরেছে এবং সিনেমা হলের অন্ধকারে, গঙ্গার পাড়ে চুম্বন করেছে একে অপরকে। নারী আধুনিক হলেও সবসময় তারা মননকে প্রাধান্য দিয়েছে। অমর মিত্রের ‘ভি আই পি রোড’ গল্পে রক্ষিতা কমলমণি তার মালিকের ভিটে ছেড়ে কোন ভাবেই যেতে চায়নি। শেষ পর্যন্ত সরকার কর্তৃক উচ্ছেদের নোটিশ আসায় সে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয়। তবু স্মৃতির শিকড় থেকে নিজেকে ছিন্ন করে না। নারীরা বহুক্ষেত্রেই পতিব্রতা এবং প্রতিশ্রুতি রক্ষাকারিণী কিন্তু পুরুষ বহুক্ষেত্রেই তাকে বাধ্য করেছে পর পুরুষের ঘরে যাওয়ার জন্য, নিজের আর্থিক অক্ষমতার কারণে। সন্তোষ কুমার মিত্রের ‘কানাকড়ি’ গল্পে মন্থা স্ত্রী সাবিত্রীকে অর্থের জন্য পরপুরুষের কাছে পাঠাতে চেয়েছে। চন্ডি মন্ডলের ‘ভাসান’ গল্পটিতে নব তার স্ত্রীকে স্বার্থের কারণে বলাই নক্ষরের ঘরে পাঠাতে চেয়েছে। সন্তোষ কুমার ঘোষের ‘কানাকড়ি’ নামক গল্পে দেখি স্বামী আর্থিক স্বচ্ছলতার জন্য স্ত্রীকে ছুৎমার্গ কাটিয়ে অন্য পুরুষদের সঙ্গে মেলামেশার নির্দেশ দিয়েছে।

নারীদের দৈনন্দিন কথোপকথনও নিম্ন লেখকদের রচনায় ধরা পড়েছে। নৃসিংহ রায়ের ‘বুকের ভেতরে চোখ’ গল্পে চলন্ত বাসে একজন নার্স অপর একজন মহিলাকে বলেন, -

“সোমা, তোর সেই পিয়াজী রঙের শাড়িটা - তোকে, হ্যাঁ হ্যাঁ, দারুণ।”^৬

নৃসিংহ রায়ের ‘গল্পের আমেজ’ গল্পে একজন নারীর প্রতি সমাজের দৃষ্টিভঙ্গিকে যথাযথ বিশেষণের মাধ্যমে তুলে ধরেন লেখক। যেমন- একজন বেকার তাকে দেখে বলে ‘ওফ্’, কবি বন্ধু বলে ‘ক্লাসিক বিউটি-স্মার্ট’ চন্দনের দিদি বলে ‘উইচিংগে’ ইত্যাদি। রবীন্দ্র গুহের ‘নাভিকুণ্ড ঘিরে’ উপন্যাসটিতে মেয়েদের তাই ‘মাল’ বলে ডাকা হয়েছে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘স্ত্রীর পত্র’ গল্পে মৃণাল পুরুষতান্ত্রিক সমাজের দিকে পদাঘাত করে বলেছে সে ‘চরণতলাশ্রয়ছিন্ন’। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে নারীরা বারবার বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। বর্তমান সমাজে নারীদের জীবনযাপন রীতি দ্রুত বদলে যাচ্ছে। বাণী বসুর রচিত ‘অক্ষর পুরুষ ও ডলস হাউস’ নামক উপন্যাসে আধুনিক সমাজের প্রতিনিধি মহাশ্বেতা বিভিন্ন পুরুষের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে এবং পছন্দের পুরুষের সঙ্গে গৃহত্যাগ করেছে। মহাশ্বেতার বোন কাদম্বরী অবিবাহিতভাবে জীবন যাপন করেছে এবং অধ্যাপনার কাজ করে গেছে। পূর্বে নারীরা পুরুষ অভিভাবক ছাড়া এক পাও চলতে পারতো না। বর্তমানে সভ্যতার যত অগ্রগতি ঘটেছে নারী মনে শিক্ষার আলো প্রবেশ করেছে এবং নারীরা আজ সবদিক থেকে সাবলম্বী ও স্বাধীনচেতা। পরিবার রক্ষার পাশাপাশি তারা অর্থনৈতিক দিক থেকেও উন্নতি লাভ করেছে। বর্হিবিশ্বে পদার্পণ করে মেয়েরা হয়ে উঠেছে অনেক বেশি দৃঢ়চেতা এবং আত্মবিশ্বাসী। পুরুষ লেখক নারীর মননের চিত্র নিখুঁতভাবে যেমন অঙ্কন করেন তেমন ভাবে নারীর অবদমিত যৌন কামনা, তাদের মৌখিক ভাষা, জীবন চর্যার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাঁদের রচনায়। পুরুষ লেখকগণ ছক ভেঙে বৃহৎ পরিসরে নারী জীবনের কথা বললেও বহু ক্ষেত্রে তাঁদের লেখায় গতানুগতিকতা স্পষ্ট। নারীদের সমস্যাময় জটিল জীবনের কথা তুলে ধরলেও তা থেকে মুক্তির পথ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তুলে ধরেননি। তবে সবশেষে বলা যেতে পারে পুরুষ লেখকগণ ঘরে বাইরে নারীদের উন্নতি ও অসহায়তার চিত্র পাশাপাশি তুলে ধরে পাঠকের দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ সক্ষম হয়েছেন। পুরুষ সমাজ তথা সংসারের রক্ষা কর্তা এই ট্যাবু ধীরে ধীরে মানব সমাজের মন থেকে দূরে সরিয়ে নারীর সম্মান, স্নেহ, ভালবাসায় পৃথিবীকে দেখার আহ্বান জানিয়েছেন সকলকে।

Reference:

১. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত, না-সাহিত্য অল্প-সাহিত্য তিষ্ঠ - বিরক্ত সাহিত্য নিম্ন সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, পৃ. ৫৫

-
২. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত, না-সাহিত্য অল্প-সাহিত্য তিষ্ঠ - বিরক্ত সাহিত্য নিম্ন সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, পৃ. ৯৩
 ৩. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত, না-সাহিত্য অল্প-সাহিত্য তিষ্ঠ - বিরক্ত সাহিত্য নিম্ন সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, পৃ. ১০৪
 ৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত, না-সাহিত্য অল্প-সাহিত্য তিষ্ঠ - বিরক্ত সাহিত্য নিম্ন সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, পৃ. ১০৭
 ৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত, না-সাহিত্য অল্প-সাহিত্য তিষ্ঠ - বিরক্ত সাহিত্য নিম্ন সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, পৃ. ১১৩
 ৬. বন্দ্যোপাধ্যায়, সৌম্যব্রত, না-সাহিত্য অল্প-সাহিত্য তিষ্ঠ - বিরক্ত সাহিত্য নিম্ন সাহিত্য, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০১৭, গাঙচিল, পৃ. ৯৫